পথ

পরেশচন্দ্র মণ্ডল

সামনেই প্রধানের ঘর। একটা লম্বাটে টেবিলের চারপাশে গোটাকতক চেয়ার— কোনোটার হাতল আছে, আবার কোনোটা হাতলহীন। পাশে দুটো লাল চেয়ার আলমারীর কোল ঘেঁষে। সাধারণ কোনো লোকাল কমিটির নেতা কিংবা পঞ্চায়েত এলেও প্লাস্টিকের লাল চেয়ারে বড্ড কেউ বসেন না। পুরোনো এই কাঠের চেয়ার গুলোই অতীতের স্মারক চিহ্নের হাল হকিকত চিনিয়ে দেয়। জানলার সামনেই দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি মারে অজিত। প্রধানের ঘরে তালা। এখনও আসেননি। কখন আসবে কেউ জানেও না। বারান্দায় প্রধানের সাক্ষৎপ্রার্থী নানা মৌজার লোক! কোন দূর-দূরান্ত থেকে তারা এসেছে!

প্রধানের পাশের ঘরটা খোলা। একটা টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে কয়েকজন। এদের মধে অজিত তার নিজের গ্রামের পঞ্চায়েতকেও দেখতে পেল। দু'জনার চোখাচোখি হতেই হঠাৎ গ্রাম - পঞ্চাৎ হাসির হররা থামিয়ে দেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, আর পঞ্চাৎ এখানে এসে দল জুটিয়ে হো হো করছে। অথচ গ্রামে লোকটা বোবা হয়ে থাকে। এলাকার সমস্যার কথা জনে জনে দরবার করে গেলেও কোনোদিন উঁকি মেরে দেখে না। যতসব, বেহায়াগুলো হয়েছে পঞ্চায়েত। অজিত মনে মনে ওকে ঘৃণাই করে। শালার ঘরচিতে সাপ! অজিত কিছু একটা বিড় বিড় করতে করতে ইরিগেশন সচিবের ঘরে হাজির হয়।

লোকটা অজিতের দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। তা না করুক, অজিত ওসব থোড়াই কেয়ার করে। গলা খাঁকার দিয়ে সচিবকে প্রশ্ন করে— আপনাদের প্রধান কন আসেন? লোকটা মাথা তোলেন। —সেতো বলতে পাবো না। লোকটার কথার ভঙ্গিতে যেন হালকা বিদ্রুপ মেশানো। অজিত গলাটা সামান্য চড়িয়ে বলে—আপনারা তাহলে কী জানেন বলুন তো? যাকে জিগ্যেস করি, সেই বলে জানে না। আচ্ছা এরকম করলে অঞ্চলটা চলবে কী করে বলতে পারেন? লোকটা নাকের খাঁজে চশমাটা লাগাতে লাগাতে বলেন— আচ্ছা মুশকিলে ফেললেন, তো মশাই! অঞ্চল কী করে চলবে, না চলবে তা সাজেশন কি আমি দেব? কাজের সময়ে ডিসটার্ব করবেন না, যান এখন।

—যাব মানে? আপনি সেচ সচিব, খব রাখেন গোলাবেড়ের বাঁধের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে? গ্রামের লোকের চাতর ভেসে যাচ্ছে নোনাজল ঢুকে। খবর রাখেন, গ্রামের রাস্তাঘাটে মানুষ চলাচল করতে পারছেনা। পাকা দালানে, অফিস ঘরে বসে খুব ডব্‌ট দেখাচ্ছেন যে! তাহলে আপনিই বলুন কার কাছে গিয়ে জানাবো? লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খান। তিনি বোধহয় ভাবেনওনি যে, বারবারের মতো আর পাঁচটা গ্রামবাসীকে তিনি যেভাবে ধমকে বের করে দেন, সেরকম নিরীহ ব্যাপারের পরিবর্তে এরকম জোরালো ঘুঁসি এসে পড়বে তার নাকে। তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি একটু দমিত হয়ে বলেন।

—উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? প্রধান সাহেব নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। আপনি শান্ত হয়ে বসুন, আমি দেখছি।

সচিব চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশের ঘরে যান। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলেন—মজিদকে বলেছি, প্রধান সাহেবকে ফোন করতে। এক্ষুনি জানতে পারবেন উনি কখন আসবেন। লোকটা আবার কাজে নিমগ্ন হলেন। অজিত দেওয়াল ঘড়ির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। ঘড়িতে কাঁটাগুলি কেমন কোমল ছন্দে এগিয়ে চলেছে। দিন - সপ্তাহ - মাস - বছর। ওদের বিরামহীন এই চলা আর পার্টিনেতাদের অযথা মুখোশ-অভিনয় প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের চরম বৈপরীত্য যেন। ঘড়িতে সকাল সাড়ে এগারো। খানিক পরেই মজিদ এসে বলল— প্রধানের আজ আসতে দেরি হবে। সন্দেশখালি ব্লক মিটিং চলছে! কখন শেষ হবে বলতে পারলেন না। অজিত তড়াক করে উঠলো—দেখলেন তো উনি কখন আসবেন; সেই অপেক্ষায় লোকগুলো চাতকের মতো হাপিত্যেস করছে। ভাবুন একবার! জনগণকে আপনারা কী চোখে দেখেন! এই জনগণ যেদিন জাগবে, সেদিন জানবেন আপনাদেও শেষ দিন!

সচিব কিছুই বললেন না। বলবেনইবা কী করে, তার হাঁ-মুখের মধ্যে অজিত যে বড় একটা পাথর গুঁজে দিয়েছে। তিনি ঝোঁক গিলতেও পারছেন না। সকাল আটটায় নাকে মুখে দুটো গুঁজে বেরিয়ে পড়েছিল অজিত। এখান থেকে অঞ্চল অফিস প্রায় চার মাইল। আষাঢ়ের প্রথমদিকে খানিক বৃষ্টি হয়েছে, তারপর অম্বুবাচীতেও মুষলধারে! সেই ফাঁকে এখানকার কেউ কেউ চাতর করে নিয়েছে। বাকিরা, পরে আরও বৃষ্টি হবে ভেবে অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সেই থেকে আকাশটা চুপ করেই আছে। রোদের তেজ যেন দিন দিন বাড়ছে! চাতরগুলোও রস হারিয়ে ফাটতে শুরু করছে। সেই চড়া রোদে পুড়তে পুড়তে অঞ্চল অফিসে এসেছে— প্রধানকে কথাটা বলার জন্য। কারণ সে জানে, ঠুঁটো পঞ্চাৎকে বলে কোনও হিল্লে কখনও হবার নয়। বরং নিজে গিয়ে পরিস্থিতিটা প্রধানকে জানিয়ে আসা ভালো।

আসলে আয়লার ঝামেলা চুকেবুকে গেছে বছর দুই আগে। ভাঙা বাঁধ টুকটাক মেরামতি হয়েছে। তবে অস্থায়ী ভাবে নয়। উফ্! সে যা দিন গেছে! বৃষ্টির মধ্যে জীবনের পরোয়া না করে দিনরার মাটি কাটা বাঁধ দেওয়া। রাতে তাঁবুর ভিতর জেনারেটর চালিয়ে কাজ। খাওয়া-ঘুম তখন গুলি মারো। আগে প্রাণ, আগে বাঁধ বেঁধে নোনা রাক্ষসগুলোকে প্রতিহত করা। জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়াই হল প্রকৃত নেতার কাজ। তবে আয়লার ক্ষতিপূরণ নিয়ে যা কেলেঙ্কারি, শহরের কাগজগুলো ফলাও করে লিখেছে। পঞ্চাৎ প্রধানের ভাল-মানুষের মুখোশগুলোও পড়েছে ঝরে। কিন্তু আক্কেল হয়নি। এলাকা সেজে উঠেছে। বিভিন্ন এন.জি.ওর দৌলতে, গ্রামের ভিতর মাটির রাস্তা তৈরি হয়েছে। পাঁচ ইঞ্চি দেওয়াল ও মাথার উপর টিনের ছাউনি হয়েছে। কেবল দুশ্চিন্তা বাঁধ নিয়ে। ঠেকনা দেওয়া বাঁধগুলো ক্রমে শরীর এলিয়ে দিচ্ছে।

গোন ওঠে বাঁধের বুক টেলে। নোনার কামড়ে ঢেউয়র গায়ে শরীর এলিয়ে দিতে পারলেই যেন বাঁচে। বৃষ্টি পেয়ে বাঁধের ফাটা বাড়ছে। গোনের ঠেলায় জল ঢুকছে ক্ষেতে খামারে। ওপর তলার নেতারা ওসব বোঝে না। ভোটে জেতার পর জনদরদী নেতাদের পিছনে দশটা করে লেজ গজায়! ভোট মেশিন এই জনগন তখন গাঙের হাবজা ও মাকো।

গতকাল ভরা কোটাল গেছে, বাঁধের ফাটল দিয়ে নোনাজল ঢুকে সোফানের ধানের চাতরটা ভাসিয়ে দিয়েছে। সামনে শ্রাবণ মাস। বৃষ্টি-বিরাম নেবে না। তার মধ্যে সতর্ক না হলে আবার ভাসবে গ্রাম। মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আগে বেশ কয়েকবার অঞ্চলকে জানিয়েছে অজিত। পিটিশান দিয়েছে এলাকার লোকজনের সই-সাবুদ সহ। তবু বে-টনক প্রধান ইরিগেশন দপ্তরের কাউকেই পাঠাননি গোলাবেড়ের এই হুলোয়।

আজ সকালেই সোফান এসে কাঁদো কাঁদে হয়ে বলল— অজিতদা, আমার চাতরের পাতা সব শেষ। এবার জমি বোরো কী দে? গেলবার নোনামাটিতে ধান হল না। এবার বাল-বাচ্চা নে পথে দাঁড়াতে হবে। সোফানের অসহায়, বেদনার্ত মুখটা আবার অস্থির করে তুলল তাকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করেই তবে বাড়ি যাব। অঞ্চল অফিসে বার কয়েক ইতঃস্তত ঘোরাঘুরি করে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রধান না আসা পর্যন্ত সে খুলনা হাটখোলায় বসে থাকবে। খেয়াঘাটেই ধরবে তাকে! এত অন্যায় আর চুপ করে মেনে নেওয়া যাবে না।

বাইরে চড়ারোদ। গাছের পাতাও নড়ছে না। অঞ্চল অফিস মাঠের শেষ প্রান্তে প্রাইমারি স্কুলে কচিকাচাদের চাপা স্বর। মাঝে মাঝে মাস্টার মশাইদের শাসন - গম্ভীর গলা। অফিসের অদূরে সরু ইঁট রাস্তার পাশে জমি জলমগ্ন। চেঁচো আর শালুকে ভরা। একটা বিড়ি টানতে টানতে আনমনা হয়ে খুলনা হাটের দিকে হাঁটা মারে সে।

(দুই)

আরে দাদা যে,... অজিত পেছনে ফেরে। খুলনা হাটে ফোন বুথে স্বপন। —হ্যাঁ, স্বপন। অজিত মাথা নীচু করে স্বপনের দোকানে ঢোকে। বেঞ্চে বসতে বসতে বলে— বাড়ির সব খবর ভালো তো? স্বপন আহ্লাদিত হয়— আপনাদের আশীর্বাদে, সব ভালই আছে। তবে অনেকদিন বাদে দেখলাম আপনাকে। আজকাল বোধহয় অঞ্চল অফিসে আসা এক্কেবারে ছেড়ে দিয়েছেন।

—কেন আসব বলতে পারো? এই পোড়ারমুখোগুলোর সামনে আসতেই আমার ঘেন্না করে। নিতান্ত দায়ে না পড়লে আজ আসতামও না। যাক্ গে তোমার আর খবরাখবর বলো।

—খবরাখবর বলতে... স্বপন আর থৈ পাচ্ছে না। খরস্রোতা ডাঁসার কিনার সাঁতরে এলেই পায়ের তলার মাটি পাচ্ছে না সে। সে কেবল স্রোতে হড়কেই যাচ্ছে! —পরিবারে শান্তিই আছে! সেই যে একবার আপনি ওকে কী যে বোঝালেন, ম্যাজিকের মতো ফলে গেল। স্বপন থিতু হয়েছে। এই তো কথারা ভিড় করে আসছে মনে। এই তো সাবলীল বোধ করছে সে!

—তা বাপু তুমিও এবার ওসব ছাইপাঁশগুলে ছাড়ো। ঘরের মেয়েছেলেতো এসব ওরা সইবে ক্যানো বলতো স্বপন লজ্জানত হয়। —ছেলের মাথায় হাত দিয়ে কিরে করিয়ে নিয়েছে-মদ আর ছোঁবে না। আপনার কথা মনে রেখেই এই অঞ্চলের নতুন পার্টি মেম্বার হয়েছি। ঢোলকদা আপনাকে খুব মানে... সবাইকে বলে...

অজিতকে উদাসীন দেখায়। বিড়িতে শেষটান দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে। —আসলে ব্যাপারটা কী জানতো, স্বপন! শুধু পার্টি মেম্বার হলেই সব নয়। তোমাকে মানুষের প্রতিটি স্পন্দন উপলব্ধি করতে হবে। তার জন্য চাই সাদা মন আর মানসিক দৃঢ়তা। এই যে তোমাদের প্রধান— তুমি ভাবতে পারো, কাউকে কোনো সংবাদ না জানিয়ে উনি মিটিং করছেন সন্দেশখালি। দূর-দূরান্ত থেকে কত মানুষ এসেছেন একটু কথা বলবেন বলে। অথচ এতটা পথ হেঁটে এসে - এই রোদের মধ্যে ওরা আবার ফিরে গেল। কেন আগের দিন প্রত্যেক পঞ্চায়েত ও লোকাল কমিটিকে ফোন করে জানাতে পারতেন না...? তাহলে বেচারা মানুষগুলো এতটা কষ্ট পেতেন না। যেদিন এই জনগণ খেপে যাবে, সেদিন দেখবে এখানেও জংগল মহলের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তখন কি এদের কেউ মাওবাদী বলবে নাকি মুক্তি সংগ্রামী বলবে? ডান ও বামের এই লড়াইয়ের মাঠ তৈরি করছে কারা? কে জবাবদিহি করবে বলো!

স্বপন ফিসফিসিয়ে বলে — খবরদার আর বাড়াবেন না। হাওয়া কিন্তু মোটেই ভাল নয়। হাটের এদিক - ওদিক ওদের লোক ঘাপটি মেরে আছে। চারিদিকে এত ধরপাকড় চলছে। সব বিষাক্ত সাপ হয়ে উঠেছে। কেউ বিরুদ্ধে গেলেই ছোবল! তড়পে ওঠে অজিত— আরে দূর দূর, রাখোতো ওদের কথা। ঢোঁড়া সাপের আবার বিষ! আমরাও পাল্টা দিতে শিখেছি— ওদের কাছ থেকেই! আসুক না বাছাধনেরা, কেমন বুকের পাটা! জোঁকের মত জনগণের রক্ত চুষযে! গরিবের লোনের টাকায় পাকা ঘরদোর তুলছে। জনগণ ছাড়বে ওদের? এই যে মাওবাদী এরা কারা, বলতে পার? এরা হচ্ছে সেই সব বঞ্চিত, অবহেলিত বিবেক। যাদের চিরকাল ঠকিয়ে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজনীতি তার শক্ত পথ তৈরি করে নেয়। মাওবাদ হল সেই বঞ্চিত বিবেকের কণ্ঠস্বর!

স্বপন বিমূঢ় হয়ে বসে থাকে। এক সেই মাও-সেতুং, যিনি সমাজ বৈষম্যের দীনতা ঘোচাতে দৃঢ় কণ্ঠে মাওইজিমের পতাকা বহন করে সাম্যের জোয়ার এনেছিলেন? না, সে এখানে এই নোনাদেশের পঞ্চায়েত - ভোটে হেরে যাওয়া নেতা অজিত ও মাওসেতুংয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ খুঁজে পাচ্ছে না। এই সামনে সে কাকে দেখেছে? মহান মাও, নাকি সত্তরের চারু মজুমদারকে! তাহলে স্বপন কী তার অজান্তেই একজন মাওবাদী হয়ে উঠেছে? যদি ঘুমন্ত বিবেকের কথাই ধরা হয়, তাহলে সেও মাওবাদী। কারণ সেও প্রতিদিন মনে মনে পঞ্চায়েত প্রধান ও নিচের তলার নেতাদের ক্রোধের

বুলেট দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে!

(তিন)

সপ্তাহখানেক পরে— অজিত ভান্ডারখালি থেকে বাজার করে ফিরছে। ইদানীং যা মালামালের দাম বেড়েছে, তাতে মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়— এই নিয়ে হাটগাছার এক হাট ফেরত লোকের সাথে কথা বলছিল অজিত। লোকটা অজিতকে চেনে। মোটামুটি ষাটের কাছাকাছি বয়স। অজিতও চেনে লোকটাকে। হাটগাছা কো - অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কাছেই বাড়ি। গোরামারির কাছে এসে লোকটা বলল—যাইগো ভাই। কথা বলে ভালো লাগল। হাটগাছায় কখনও এলে ঘুরে যেও!

অজিত রায়মঙ্গলের পাড় ধরে বাড়ির দিকে হাঁটছিল। আজকের বিকেলটা ভালোই লাগছে তার। রোদের আভা মরে এসেছে। রায়মঙ্গল ও কলাগাছির সঙ্গমে একদল বালি হাঁস শান্ত স্রোতে ভেসে চলেছে, অজিত মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। নদীতে যেন ভাটা। বিশালদেহী রায়মঙ্গল এখন শীর্ণ পাতলা ও মন্থর! অথচ জোয়ারের সময় নদীটা শিকার - লোভী বাঘের মত লেজ আছড়াতে আছড়াতে লোকালয়ে ঢোকে ক্ষুধার্ত হয়ে। আজন্মা ক্ষিদে যেন নদীটার। সেই ক্ষিদের জ্বালা মেটাতে বাড়ি, ঘরদোর, মানুষ অবলীলায় গিলে খায়। অভিশপ্ত নদীটার কার উপর যে এত রাগ!

অজিত টান পায়ে বাড়ি মুখো হাঁটে। দেখতে দেখতে পথ ঘাট নিবিড় আঁধার। এদিকটায় বেশ ঘন জঙ্গল। কলাগাছির পেটে পেটে এখন জমাট রাত্রি। আকাশে মেঘ নেই! বিন্দু বিন্দু আলোর মিছিল নিয়ে যেন সে নীহারিকার দেশে চলেছে। আকাশ আর পার্থিব পৃথিবীর মধ্যে সে কোনো ফাঁক খুঁজে পায় না। আকাশে তারার মিছিল আর তার চলার গতি সমার্থক হয়ে যায়। পেছনের আদিবাসীর পাড়ায় শত যুগের লাঞ্ছনার টেমি আলো। সে আলো কেরোসিন শূন্য টেমির সলতে নিংড়ে বেরচ্ছে। অজিত কোন সুদূরের এক অনাগত আহ্বান শুনতে পাচ্ছে। দেশে দেশে মানুষ জাগছে। অন্যায় ও বঞ্চনার শিকড় উপড়ে ফেলে জাগরণ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধে জ্বলে উঠছে। ভিতরে ভিতরে ফুলে উঠছে মহাজাগতিক বন্ধনহীনতার অতলস্পর্শী - জোয়ার। আজ তার কেবলই মনে হচ্ছে— আমরা পারব, বঞ্চিত এই মানুষেরা অধিকার পাবে মর্যাদা পাবে।

একখানটায় কোনো পাড়া নেই। মানুষ নেই পথে। উত্তেজিত-শিহরিত অজিত হঠাৎ তার গতি ফিরে পায়। অনন্ত পথ যেন সে পেরিয়ে যাওয়ার সাহস ধরে। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে একদল লোক বেরিয়ে আসে। মুখে কালো কাপড় বাঁধা। হাতে বন্দুক। চমকে উঠলেও ভয় পেল না সে। —কারা তোমরা? কী চাও? —একজন উত্তর দেয় আপনাকে? —কেন? আমার সাথে কী দরকার? —যারা জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে, যারা পার্টির নামে জনগণের টাকা বেমালুন হজম করে ফেলছে। তাদের খতম করার জন্য আপনাকে দরকার। অজিতের গলা শক্ত হয়ে ওঠে। —এটা ঠিক পথ নয়। —তবে যে আপনি খুলনা হাটখোলায় বলেছিলেন মাওবাদীরা ঘুমন্ত বিবেক? তাহলে কী সেটা মিথ্যা বলেছিলেন?

—ঠিকই বলেছিলাম। তবে অযথা সন্ত্রাসের কথা বলিনি। প্রতিবাদের অন্য পথ আছে।

—কী সে পথ? —আমি জানি না। তোমরা যে পথে চলতে চাইছো, ঠিক পথ নয়, চারু মজুমদারও এই ভুল করেছিলেন। কালো মুখোশ ঢাকা লোকগুলো হঠাৎ অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল। অজিত ওদের খুঁজতেই চাইল না।

বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে আর একদল লোক তাকে ঘিরে ধরল। অন্ধকারে কাউকে চেনা গেল না। অজিত বলল—তোমরা কারা? কী চাও? —তোকে চাইরে শালা। নেতা হইছিস না? প্রধানের সাথে টক্কর নিতে চাস? —আমি বুঝতে পারছি না তোমরা কারা? তবে যেই হও শুনে রাখো মৃত্যুভয় আমি পাই না। আর সেই ভয়ে আমার কণ্ঠও কেউ রোধ করতে পারবে না। —তবে রে এত তেজ? এত অহংকার? বলেই একজন তার দু'হাত পিছ মোড়া করে ধরল। আর সামনে থেকে কয়েকজন তার বুকে পেটে সামনে কিল - ঘুশি-লাথি মারতে লাগল! অজিত যন্ত্রণায় কাঁকিয়ে উঠল। একজন তার কপালে একটা এ কে ৪৭ ঠেকিয়ে বলল— বেশি ত্যাঁদড়াদি করলে ফুটিয়ে দেব শালা। ফের যদি কোনোদিন শুনেছি - প্রধানের বিরুদ্ধে কথা বলেছিস খতম করে দেব।

লোকগুলো অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। হাতের ব্যাগ হাতড়ে সে পেল না। বুকের খাঁচায় খুব ব্যাথা —দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাত দুটো এমন মুচড়ে দিয়েছে নাড়াতে পারছে না।

—উফ্, মাগো।

সেদিন খুলনা হাটখোলার স্বপনের কথা তার মনে পড়ল। আবার জঙ্গলবাসী কালো মুখোশ পরা সশস্ত্র যুবকদের কথাও তার মনে রিন্ রিন্ করে বাজতে লাগল। কোন পথটা ঠিক-কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছে না অজিত।

রাত বাড়ছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গেছে। দু'হাতে ব্যান্ডেজ। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে সে। ঘুমের মধ্যে সে আবার মুখোশ পরা লোকগুলোকে দেখতে পেল। তারা চার চারপাশে ঘিরে হা-হা করে বিকট হাসছে! সে হাসির শব্দে পৃথিবীটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর ওরা বলছে— কোনটা ঠিক পথ স্যার। কেন পথটা ঠিক? তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে, ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘরের জানালা দিয়ে সে বাইরের ফর্সা আকাশটাকে দেখতে পেল। আর দেখল বাইরে ঝর-বৃষ্টি ঝরছে।